নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, পৃ:৫০-৬৮
©২০০০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

# বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির ভাষা: একটি বিশ্লেষণ

আব্দুল লতিফ মাসুম*

ক. 'মানুষের সর্বপ্রকার বৈষয়িক এবং আত্মিক সৃজন ও সম্পদের ব্যাপক' উপস্থাপনার নাম যদি হয় সংস্কৃতি (করিম ১৯৮৬:১৫৩-৫৪) তাহলে রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌথ ক্রিয়াকাণ্ডের ফসল হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক চিন্তায় কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার সদস্য বা নাগরিকদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোব"ত্তিকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা চলে (হাসান উজ্জামান ১৯৭৮:১০২)। প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরেই কতকগুলো প্রবণতা বা মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি এবং দক্ষতা (attitudes, beliefs, values, sentiments and skills) হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক একটি উপাদান। এসব কিছুই রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থার চালচিত্র তুলে ধরতে এবং কার্যব্যবহার মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড এবং ভার্বা (Almond & Verba 1963) রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১। সংকীর্ণতামুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture)
২। নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subjective Political Culture)
৩। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture)

শিক্ষা ও ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগের অভাবহেতু জন্ম নেয় সংকীর্ণতামুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর ঔদাসিন্য এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। উন্নয়নশীল দেশ এমন রাজনৈতিক সংস্কৃতির চারণভূমি। নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানে হচ্ছে একটি উন্নত ও পরিণত পরিবেশ সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যক্রমে নাগরিকদের নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি। কোন কোন অতি উন্নত দেশ জীবনের প্রাচুর্য এবং চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কারণে আর কিছুর

---

* শিক্ষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি আগ্রহ রাখে না। মার্কিন মুলুকে এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সে দেশের জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ তাঁদের প্রেসিডেন্টের নাম জানে না।

অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে উত্তম নাগরিক চেতনার ফসল। এই সংস্কৃতিতে নাগরিকগণ ব্যক্তিগত অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে পুরো সচেতন থাকে। রাজনৈতিক কার্যক্রমে, যেমন নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্যক্তি বা নাগরিকের ভূমিকা সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে।

কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সমভাবে প্রকাশিত হয় না। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কখনো সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয় মতবাদকে 'জনমত' হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সব সমাজে সংস্কৃতির রকমফের সমানভাবে কার্যকর নয়। একারণেই সংকীর্ণতামুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ক্ষেত্র বিশেষ অংশগ্রহণকারী সংস্কৃতি বলে প্রতিভাত হতে পারে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি, এর বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত থাকে না। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কৃতি সব সময়ই মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed Culture)। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল মিশ্র সংস্কৃতিরও প্রকারভেদ করেছেন (Almond & Powell 1972)।

১। সংকীর্ণতামুখী নিষ্ক্রিয় সংস্কৃতি (Parochial Subject Culture)
২। নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারী সংস্কৃতি (Subject Participatory Culture)
৩। সংকীর্ণতামুখী অংশগ্রহণকারী সংস্কৃতি (Parochial Participatory Culture)

এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে গঠিত হয় Civic Culture.

খ. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের রয়েছে নিজস্ব গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের উপস্থিতি ঘটছে এর অব্যাহত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আমাদের জনগণের হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস জীবনবোধ ও মুক্তি সংগ্রাম প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের রাজনীতির ভাষায়, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। বিগত সিকি শতাব্দীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অনুসৃত বিধিব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দিয়েছে একান্ত নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য। Trial and Error এর মধ্যদিয়ে সাম্প্রতিক কালপর্বে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ব্যাকরণ সম্মতভাবে বা প্রথাসিদ্ধভাবে আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক মাত্রাবোধ বা সিভিক কালচার গভীরভাবে শিকড় গাড়েনি, তবুও গণতান্ত্রিক সচেতনতাবোধ আমাদের মানসে ভালোভাবে জেকে বসে আছে। আমাদের নিকট অতীতের সিকি শতাব্দীর রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস এবং দূর অতীতের শতবর্ষের ইতিহাস প্রমাণ

করবে বাঙালী জনগোষ্ঠী একটি স্বাধীনচেতা জাতি। অতীতকাল থেকে এই জনগোষ্ঠীর অগ্রগমনের ঘটনা ইতিহাসে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। ব"টিশ যুগে ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে বলা হত 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow' কাকতালীয় হলেও সত্য যে, এই উপমহাদেশের আত্ম জাগৃতির দু'টো প্রবল সংগঠন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম এই অবিভক্ত বঙ্গে-কলিকাতা ও ঢাকায়। 'হুজুগে বাঙাল' বলে এই জনগোষ্ঠীর একটা বদনাম আছে। সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবরে' লিখেছেন, 'বঙ্গাল মুলুক আছে যেখানে রাস্তার পাগলও যদি সিংহাসনের দাবি করে তাঁরও সমর্থক পাওয়া যায়'। এসব প্রবণতার প্রমাণ মেলে যথাক্রমে ১৯৩৭, ১৯৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ এর কোন কোন নির্বাচনে। এক এক সময় বিপরীত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দল ও ব্যক্তিকে আমরা জয়ী করেছি এমন ঝোঁক এখানে অনেকটা কার্যকর ছিল। আবার যাকে দিই উজাড় করেই দিই। ঐসব নির্বাচনী ফলাফলে তার প্রমাণ মিলবে। এসব নির্বাচন রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং আমাদের আত্মজাগৃতির ইতিহাসে ম্লান অবদান রেখেছে। আমাদের সম্পর্কে আর একটি কথা বলা হয়, We do not act but we react. নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আমরা সমস্যাকে মোকাবেলা করি। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে - ১৯৪৭ সালে আমরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেই দেশ বিভাগ করেছি, ১৯৫২ সালে যখন বলা হয়েছে রাষ্টভাষা উর্দু হবে তখনই কেবল আমরা অধিকতর দৃঢ়তার সাথে বাংলার কথা বলেছি। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চে আমাদের উপর হামলা চাপিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিনি। এমনকি পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন '৯১ এবং '৯৬ এর নির্বাচনী ফলাফলও নেতিবাচক রাজনীতির ফসল।

গ. তবে আমরা যে প্রতিবাদী শক্তি তাতে সন্দেহ নেই। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই আমরা অর্জন করেছি জাতীয় মানচিত্র। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ সবই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বছর। তবে এসব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ নিয়মতান্ত্রিক পথেই প্রথমতঃ অগ্রসর হয়েছে। ব"টিশ যুগে 'যুগান্তর' বা 'অনুশীলনী'র স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসকেও এই জাতি অবশেষে অনুসরণ করেনি। ১৯৭১ সালে নিয়মতান্ত্রিক প্রথা প্রকৃতিকে অনুসরণ করার সমস্ত উপায়-উপাকরণ আমাদের নেতারা ব্যবহার করেছেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা ব্যালটের রায়কে যখন বুলেট দ্বারা প্রতিহত করার অপচেষ্টা হয়েছে কেবল তখনই বাংলার দামাল ছেলেদের হাতিয়ার গর্জে ওঠেছে। আমাদের ব"হত্তর জনগণ শান্তিপ্রিয়। রাজনৈতিক কারণ তো দূরে থাক ব্যক্তিগত কারণেও তাঁরা দাঙ্গা হাঙ্গামা ঝক্কি-ঝামেলা সঙ্কট পছন্দ করেন না।

তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমী অর্থেই গ্রহণযোগ্য। এমনকি বর্তমান সময়ে সর্বব্যপ্ত সন্ত্রাসের সাথে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কোনই সম্পর্ক নাই। বরং তারা সন্ত্রাসবাদ তথা মাস্তানিকে ঘ"ণা করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক স্বল্প ভাগই শিক্ষিত। এ শিক্ষিত জনসংখ্যা থেকে প্রতিবাদী বা রাজনৈতিলক সচেতন 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী সব সময়ই ক্রিয়াশীল রয়েছে তবুও সামগ্রিক বিচারে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত থাকার ফলে 'সিভিক কালচার' বা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠছে না। এছাড়া আমাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী শহরবিমুখ লোকজ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বছরগুলো থেকে বর্তমান (২০০০) পর্যন্ত পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শহরমুখী জনসংখ্যা ব"দ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে সংখ্যা ব"দ্ধি ঘটেছে শহরে কর্মপ্রত্যাশী ছিন্নমূল মানুষের। এতদসত্ত্বেও ব্যাপক নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। নাড়ীর টান পড়ে রয়েছে 'জন্মভূমি' গ্রাম দেশে। ধর্মীয় উৎসবে শহরগুলোতে যখন জনবিরল অবস্থা বিরাজ করে, তখন বোধ হয় আমাদের উৎসভূমি বা 'রুটস' হচ্ছে শাশ্বত গ্রাম। এই গ্রামীণ সংস্কৃতির আদি এবং অকৃত্রিম আবেদন হচ্ছে পেটে একমুঠো ভাত চাই, রাত্রে শান্তিতে ঘুমোতে চাই। বেশী আর কিছু চাই না। রাজনীতিকে না বুঝেই তাঁরা বলে 'দলাদলি'। তাঁরা মনে করেন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামগুলো' দলাদলিতে জড়িয়ে যাওয়া ভাল না। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এই রাজনৈতিক অসম্প"ক্ততা দেখে রাজনৈতিক দলগুলোও গ্রামগঞ্জে তাঁদের শাখা প্রশাখা বিস্তারে তেমন উৎসাহী নয়। সে কারণে রাজনীতি শহরকেন্দ্রিক, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, আমাদের এ সমাজে 'এলিট-মাস গ্যাপ' পুরো মাত্রায়ই বিরাজমান। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনজীবন যুক্ত নয়। তাই বাংলাদেশী একজন গবেষক বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে 'সংকীর্ণতামুখী নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (Parochial Subject Political Culture) বলে অভিহিত করেছেন।

ঘ. ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যেও বাংলাদেশ প"থিবীতে অনন্য। নদ-নদী ও সবুজের এরকম নিবিড় সমারোহ প"থিবীতে বিরল। নদীমাতৃক হওয়ার কারণে বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর এবং অত্যধিক ঘন বসতিপূর্ণ। অল্প আয়াসে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় বলে এদেশের মানুষ কিছুটা অলস ও শ্রমবিমুখ। ম"দু আবহাওয়া বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করে তুলেছে। এই জনগোষ্ঠীর আবেগময়তায় এবং তাঁদের পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠতায় প্রকৃতি বিশেষভাবে প্রভাবশীল। এদেশের বর্ষাকালে বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, নদীর ভাংগা-গড়া, জলোচ্ছাসও বাংলাদেশের মানুষকে নরম আর সংগ্রামশীল করে তুলেছে। প্রাচীনকালে বাংলার আর এক নাম হল 'বুলঘকপুর' অর্থাৎ বিদ্রোহের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অতীতে বাংলাদেশের

জনচরিত্রের ধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম।

এই সব প্রত্যয় আর প্রবণতার প্রেক্ষিতেই নির্ণিত হবে আমাদের রাজনীতির ভাষা তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ। উচ্চারিত শ্লোগান সন্নিবেশিত দেয়াল লিখন, প্রকাশিত বিব"তি প্রমাণ করছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন্ স্তরে আমাদের অবস্থান। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন অদৃশ্য বিষয় নয়। অথবা নয় কোন কাব্যিক কল্পনা। আমাদের মন ও মনন, মানুষ ও মানস এতে বিবৃত। এসবের স্বরূপ সন্ধানেই বেরিয়ে আসবে রাজনীতির স্বচ্ছ চেহারা। তাই আমাদের এই সংযোজনকে বলা যেতে পারে আজকের রাজনীতির আয়না।

উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের পর স্পষ্ট প্রবণতাসমূহ নিম্নরূপ:

১. অস্থিরতা: ইতোপূর্বে বিব"ত হয়েছে জনচরিত্রের দিক দিয়ে আমরা একটি অস্থির জাতি। আমাদের সংগৃহীত উপাত্ত এ প্রবণতার প্রমাণ করে। মিছিল মিটিং এ যখন উচ্চারিত হয় 'এ্যাক্শন এ্যাক্শন ডাইরেক্ট এ্যাক্শন' অথবা 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালে'- তখন এর মধ্যদিয়ে সামাজিক অস্থিরতাই প্রমাণিত হয়। তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, ডান-বাম পক্ষ-বিপক্ষ ক্ষমতাশীল অথবা ক্ষমতাহীন দল সবারই সর্বাগ্রের শ্লোগান হচ্ছে, 'এ্যাক্শন এ্যাক্শন ডাইরেক্ট এ্যাক্শন।' এই এ্যাক্শান শব্দে এবং ভাষায় এক হলেও প্রয়োগে বিপরীতমুখী। এক দল আর এক দলের বিরুদ্ধে, ডানপন্থীরা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে, সরকারি দল বিরোধী দলের বিরুদ্ধে, বিরোধী দল সরকারি দলের বিরুদ্ধে, হরহামেশা এই এ্যাক্শনের শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং এবং কোন্দলকেও এক গ্রুপ আর এক গ্রুপের বিরুদ্ধে এ্যাক্শনের শ্লোগান দেয়। এমনকি ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত কারণে রাজনৈতিক কর্মীরা, শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকেরা, কল-কারখানার মজুরেরা, সরকারি কর্মচারিরা স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বত্র সবসময় এই শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বিপদজনক ব্যাপার হল কখনো কখনো 'এ্যাক্শন' শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। বাস্তবেই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে বিবদমান গোষ্ঠীগুলো। ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক মারণাস্ত্র। বন্দুকযুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছে সবুজ সতেজ তরুণ।

ঘটনার আকস্মিকতা অথবা ক্রোধ দ্বারা কোন বন্দুকযুদ্ধ অথবা হত্যার ঘনঘটা বোঝা যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় নীতি ও আদর্শ নির্ধারণের পর যা দেয়ালে লেখা হয় তাতেও যদি অস্থিরতা আর হিংসার দাবাগ্নি ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে কী এটাই বুঝতে হবে যে অস্থিরতা আমাদের মজ্জাগত।

২. অসহিষ্ণুতা: অসহিষ্ণুতা রাজনৈতিক অঙ্গনের আর একটি অনুষঙ্গ। সহিষ্ণুতা যেখানে Civic Culture এর অনিবার্য শর্ত, সেখানে বাংলাদেশের Political Culture এ ঠিক এ সময়ে বিরাজ করছে চরম অসহিষ্ণুতা। শ্লোগান দেয়াল লিখন

ও বিবৃতি যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, দেখা যাবে একদল অপর দলকে কোনক্রমে সহ্য করতে পারছে না। উৎখাত বা নির্মূলের গ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে। এক গ্রুপ আর এক গ্রুপকে মেনে নিতে পারছে না। আর নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব নিয়ে 'লড়াই' এতটাই প্রকট যে শ্লোগান ওঠে '...চামড়া তুলে নেব আমরা' অথবা 'আর যদি রক্ত ঝরে তোর কবর হবে।' 'রক্ত রক্ত রক্ত চাই ... এর রক্ত চাই'। অসহিষ্ণুতা এতটা পর্যায়ে পৌছেছে যে, দলীয় বলয় অতিক্রম করে ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যন্ত এটি প্রসারিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী তাঁর নেতার বিরুদ্ধে, অসন্তুষ্ট কর্মচারী তাঁর বসের বিরুদ্ধে এমনকি অবাধ্য ছাত্র তাঁর শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঐ একই শ্লোগান উচ্চারণ করছে। এক্ষেত্রে ভদ্রতা বা চক্ষুলজ্জা কোন কাজে আসছে না।

৩. অরাজকতা: অস্থিরতা এবং অসহিষ্ণুতা জন্ম দিচ্ছে এক অরাজক অবস্থার। মারামারি, লাঠালাঠি, ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও, বোমাবাজি, গুলি, হত্যা এবং লুটতরাজ এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবশ্যিক উপকরণে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিফলন ঘটে মিছিলে, দেয়ালে, বক্তৃতায়, এমনকি বিব"তিতে। শ্লোগান ওঠে, বুবুজান অথবা ভাবীজান- বাংলা ছেড়ে চলে যান। ধইরা ধইরা জবাই কর, অথবা রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই।

৪. দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ: একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা Civic Culture এ রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে যে Working Relation ধারা দরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তা অনুপস্থিত।

রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন লাঠালাঠি সংঘর্ষ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তেমনি দেয়ালেও এর বহিঃ প্রকাশ ঘটছে। শ্লোগানেও সর্বদা প্রত্যুত্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। একজন গবেষকের ভাষায় 'সেকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধের সূচনা ঘটত শিঙ্গা ভেরী বাজিয়ে। একালে ভোটপর্বে, যা যুদ্ধই সর্বাগ্রে ঢাকের লাঠি পড়ে দেয়ালে (গায়েন ১৯৯১)। ভোটপর্ব ছাড়াই আমাদের দেয়ালের দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ রীতিমত চোখে পড়ার ব্যাপার। প্রতিপক্ষের দেয়াল লিখন সময়ে আক্রমণ অথবা মুখে ফেলা অথবা বিকৃত করে দেয়া অথবা নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে পরিবর্তন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিস্থাপন ব্যাপারটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেছে, গোলাম আযম ইস্যুকে কেন্দ্র করে। যেমন: কেউ লিখেছে গোলাম আযমের ফাঁসি চাই। প্রতিপক্ষ ফাঁসি মুছে দিয়ে 'মুক্তি' লিখে দিয়েছে। আবার কেউ অধ্যাপক শব্দের আগে রাজাকার লিখে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুকে কেন্দ্র করেও এরকম পরিবর্তন চোখে পড়েছে। দেয়ালে লিখন ছিল এরকম, 'লাখো শহীদ খবর পাঠাল, রাজাকারদের কবর দে।' বিরোধীরা রাজাকারদের পরিবর্তে ভারতীয় দালাল শব্দটি প্রতিস্থাপন করেছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বাইরে আরও যা দেখা গেছে তা হলো বিকৃত করা, অদূরেই বিরূপ মন্তব্য লিখে দেয়া। এছাড়া দেয়ালগুলোতে সারাক্ষণ সঠিক বা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে অপবাদ আকীর্ণ রয়েছে।

৫. অকপটতা: আমাদের শ্লোগান, দেয়াল কথা তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অস্থির, অসহিষ্ণু, অরাজকতা, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ইত্যাদি 'অ' এর বাইরে আরও কিছু 'অ' যেমন অহেতুক, অসংলগ্ন, অনুদার, অপরিণত, অসার ইত্যাদি নেতিবাচক 'অ' সংযোজিত হতে পারে। তবে কিছু ইতিবাচক 'অ' উল্লেখযোগ্য আর এসব হল, উচ্চারণে বা দেয়ালে কোন অস্পষ্টতা নাই। বলা যায় এই সব কথামালা প্রত্যক্ষ বক্তব্যধর্মী বা সরাসরি অর্থাৎ অকপট বা অকৃত্রিম।

৬. সঙ্কট: বিগত '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এবং তৎপরবর্তী এক দশকের সমীক্ষায় বলা যায় একটির পর আর একটি সঙ্কট আমাদের রাজনৈতিক দিগন্তকে বারবার করেছে মেঘ ভারাক্রান্ত। তাই আমাদের গবেষণার বিশেষ দুটো ক্ষেত্রে শ্লোগান এবং দেয়াল লিখন থেকেছে সমস্যকেন্দ্রিক। যে সমস্যা কখনো শাসননীতি, কখনো ইস্যু, আবার কখনো বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। '৯০ এর শ্লোগান আর দেয়াল লিখন, ছিল স্বৈরাচার বিরোধী, গণতন্ত্র প্রত্যাশী, '৯২ এর ইস্যু ছিল গোলাম আযম, '৯৪ এ তসলিমা নাসরিন, '৯৫ এ কেয়ার টেকার ইস্যু এবং অবশেষে '৯৬ এ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোন, ৯৭ এ উপ-আঞ্চলিক জোট, এক কথায় ভারত বিদ্বেষ, ৯৮ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, ৯৯ এ ট্রানজিট, ২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইন তথা সরকার হঠাও এর এক দফা আন্দোলন।

সমস্যা এবং সঙ্কট একটি জাতির জীবনে নতুন কিছু নয়। দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সমস্যা বা সঙ্কট মোকাবেলায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political System) কি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে। আরও একটু পরিস্কার করে বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটরা কী মনোভঙ্গি গ্রহণ করেছে বা জনারণ্যে সমস্যাটি তাঁরা কিভাবে উপস্থাপন করেছে সেটিই বিবেচ্য বিষয়। Civic Culture বা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মানদণ্ডে আমরা দেখতে চাই কোন সমস্যার ক্ষেত্রে নেতা নেত্রীদের ভূমিকা কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করতে কতটা সহায়ক হয়েছে।

'৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং পরবর্তী '৯১-এর সাধারণ নির্বাচনে আমাদের রাজনীতিবিদরা ছিলেন সুদৃঢ় এবং সমঝোতামুখী। '৯১-এ এই জাতির মৌল শাসন কাঠামোর দিক নির্দেশনায় রাজনৈতিক নেতৃব"ন্দ অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। ১৯৯২ সালে একজন 'বিতর্কিত ব্যক্তিকে' নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ১৯৯৫ সালে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। সমস্ত আপোস এবং সমঝোতা প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর ১৯৯৬-এ ঘোষিত একক নির্বাচন ও ক্ষমতাসীন সরকারের পতনের জন্য বিরোধী পক্ষ মারমুখী হয়ে ওঠে। একটি কন্টকাকীর্ণ রক্তক্ষয়ী অসহযোগ আন্দোলনের ফলে 'গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার' এর পতন ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ধারণা

সাংবিধানিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করে। ৯৬ পরবর্তী রাজনৈতিক দৃশ্যপট যেন ৯১ পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 'ফ্লাশ ব্যাক।' ২০০০ সালের মধ্যখানে এসে বলা যায়ঃ

এসব ঘটনা পরস্পরা প্রমাণ করে একটি সংসদীয় রাজনৈতিক পদ্ধতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার জন্য যে Civic Culture বা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল যে সময়ে সর্বাধিক, ঠিক সে সময়ের পরীক্ষায় সঙ্কট উত্তরণে রাজনৈতিক এলিটরা ব্যর্থ হয়েছেন।

৭. ভাবাদর্শের সংঘাতঃ বাংলাদেশে একটি তীব্র ভাবাদর্শের সংঘাত চলছে। '৭৫ সাল এই ভাবধারার পালাবদলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান জাতিকে চারটি মূলনীতি প্রদান করে। এগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। ১৯৭৫ সালে বিশেষতঃ জিয়াউর রহমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জিত হয়। আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিস্থাপিত হয়। সমাজতন্ত্র সময়ের বিবর্তনে আবেদন হারিয়ে ফেলে। 'অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার অর্থে' তা টিকে থাকে। জাতীয়তাবাদও নতুন ব্যঞ্জনা অর্জন করে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়।

জাতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে এই সব মৌলিক পরিবর্তনকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী অংশ 'পাকিস্তানী ভাবধারা' তথা 'দ্বিজাতি তত্ত্বে' প্রত্যাবর্তনের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। অপরদিকে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা একে জাতির লালিত বিশ্বাস ও জীবনবোধের প্রতিধ্বনি বলে দাবি করে (বিতর্কটি সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার জন্য দেখুন, জাহাঙ্গীর ১৯৯০)। দেখা যায় দেয়াল লিখন ও শ্লোগানে ঐসব বিতর্কই নানাভাবে নতুন করে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাঙালী বনাম বাংলাদেশী, ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ, স্বাধীনতার সপক্ষ বনাম বিপক্ষ ইত্যাদি। একে অপরকে, একদল অপর দলকে, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে 'বিদেশের দালাল' বলে অভিহিত করা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৮. মুক্তিযুদ্ধঃ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। দেয়াল লিখন, রাজপথের উচ্চারিত শ্লোগান অথবা নির্বাচনী বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। '৯১-এর সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থিতায় 'মুক্তিযুদ্ধ' একটি সফল বিশেষণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। '৯১-এর পরবর্তীকালে '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় সময়কাল আবার লাইম লাইটে চলে আসে। '৯৬-এর

'গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার' বিরোধী আন্দোলনে এবং ১২ জুন '৯৬-এর নির্বাচনে সহিষ্ণুতার পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও বিগত '৯১ থেকে '৯৬ সময়কালকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির উত্থানকাল বলে বিবেচনা করা যায় এ সময় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দৃষ্টিগ্রাহ্য শ্লোগান বা দেয়াল লিখন হল, 'সব সাথীরা খবর পাঠালো রাজাকারদের কবর দে' অথবা '৭১-এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেক বার।'

৯. ধর্ম: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা বক্তব্যে ধর্ম আর একটি অনিবার্য বিষয়। রাজনৈতিক শ্লোগানে দেয়াল লিখনে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের পোষ্টার ও লিফলেটে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় (প্রতীকি প্রত্যয়ের জন্য দেখুন, হোসেন ১৯৯২)। তবে এর রকম ফের রয়েছে। যেমন, ডান ধারার দলগুলো 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর' ব্যবহার করেছে উদ্বোধনী শ্লোগান ও লিখনের প্রথমে। আওয়ামী লীগসহ বাম ধারার দলসমূহ উদ্বোধনী শ্লোগান হিসাবে কখনো 'নারায়ে তাকবীর' ব্যবহার করেনি। তবে তাদের পোষ্টার ও লিফলেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবর' এর বাংলা প্রতিশব্দ আল্লাহ সর্ব শক্তিমান ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া শ্লোগানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' 'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' এ রকম উচ্চারণ ছিল বহুল। নির্বাচনী সভাগুলোতে ইসলামী সম্বোধন এবং 'আচ্ছালামু আলাইকুম' খোদা হাফেজ এবং ইসলামী পরিভাষা (ইন্‌শাল্লাহ, মাশাল্লাহ ইত্যাদি) এর ব্যবহার ছিল ব্যাপক। তাছাড়া, '৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে ব্যক্তিক্রমধর্মী ছিল আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার হজ্ব পরবর্তী ইসলামী পোশাক। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকেই তাদের আবেদনের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন, জামায়াতে ইসলামী সর্বত্র 'আল্লাহর আইন' 'আল কোর-আনের পার্লামেন্ট' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছে। মধ্যপন্থী বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি 'আল্লাহর প্রতি আস্থা' ও ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলেছে।

১০. উত্তরাধিকারের রাজনীতি: সম্মোহনী নেতৃত্বের (Charismatic Leadership) উত্তরাধিকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর একটি মৌল বিষয়। তৃতীয় বিশ্বের এমনতর সম্মোহনী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্ত"ত্ব ও বিকাশ নতুন কোন ঘটনা নয়। বাংলাদেশে এর বিশেষত্ব এই কারণে যে প্রধান দু'টি দল এর নেতৃত্ব সম্মোহনী রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের ফলেই রাজনীতিতে এতটা প্রবল। প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের শ্লোগান, দেয়াল লিখন, পোষ্টার, লিফলেট এবং বক্তব্যে ঐ মরহুম দুই নেতার উপস্থিতি অনিবার্য। জাতির স্থপতি হিসাবে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম। অপরদিকে, 'স্বাধীনতার ঘোষক', 'আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার' ইত্যাদি বিশেষণে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম। প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি পোষ্টারে এবং অনেক দেয়াল

লিখনে আবেগের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে দু'জন নেতার নাম এবং প্রতিকৃতি। আবেগ জন্ম নিচ্ছে কবিতার মতো সুন্দর দেয়াল লিখনের।' যেমন, 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান' অথবা 'জিয়া তুমি আছ মিশে সারা বাংলার ধানের শীষে।' এরকম হাজারও শ্লোগান ব্যবহৃত তাঁদের চির বহমান ও ধারাবাহিক প্রমাণের লক্ষ্যে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সত্যিই এটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কোটি কোটি মানুষ আজো তাদের মহান গৌরবে উদ্দীপ্ত। বাংলাদেশের রাজনীতি প্রমাণ করেছে যে জীবিত একজন শেখ মুজিবের চেয়ে ম"ত শেখ মুজিব অনেক শক্তিশালী। অনুরূপ অভিধা জিয়াউর রহমানের ব্যাপারেও সত্য। একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার এই যে, আওয়ামী ধারার রাজনীতিতে নেতা নেত্রীর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে নীতি ও আদর্শের কথাও বলা হয়। কিন্তু বিএনপি ধারার রাজনীতিতে একটি মাত্র নাম এবং শুধুমাত্র একটি নামেই শ্লোগান উচ্চারিত হয়।

১১. ব্যক্তি প্রাধান্য: আমাদের সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি প্রমাণ করছে যে, উপযুক্ত সম্মোহনী নেতৃত্বের বাইরে যে সব রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্ব আছে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর। একটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী প্রাধান্য না পেয়ে যখন ব্যক্তির নামটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় শ্লোগান অথবা দেয়াল লিখনে তখনই বুঝতে হবে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাই মুখ্য; আদর্শ নয়। এ ধরনের লিখনে রয়েছেন একজন প্রবীন রাজনীতিবিদ, একজন বাম ধারার অধ্যাপক নেতা, একজন স্বঘোষিত দার্শনিক এবং 'মার্শাল' নামধারী রাজনৈতিক নেতা। তরুণদের বিশেষতঃ ছাত্র নেতাদের এই ব্যক্তি সর্বস্বতা সমস্ত লৌকিকতা অতিক্রম করেছে। ছাত্রনেতারা 'কিংবদন্তির মহানায়ক', 'রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা' 'সময়ের সাহসী সন্তান' 'সূর্যসারথী' 'অকুতোভয় রণতুর্য' ইত্যাদি অভিধায় অভিসিক্ত হচ্ছে। গ্রেফতার, জেল খাটা বা হুলিয়া ধারণ ইতিবাচক বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনও দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে বা সমাজে বা প্রতিষ্ঠানে নাম নাই অথচ দেয়ালে দেয়ালে সেই সব নাম অনেক বড় বড় অক্ষরে দেয়ালের শোভা বর্ধন করছে। জনগণের দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে। এভাবে জনখ্যাতির লিপ্সা চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

১২. মৌল সমস্যার অনুপস্থিতি: একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদের রাজনীতির ভাষায় তথা সংগৃহীত শ্লোগান বা দেয়াল লিখনে গোটা জাতির মৌল সমস্যাবলী প্রায় অনুপস্থিত। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বেকারত্ব, নারীর অধিকার, সামাজিক অবক্ষয় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর স্পষ্ট বক্তব্যভিত্তিক দেয়াল লিখন বা শ্লোগান, এক রকম আমাদের গোচরীভূত হয়নি। হালকা প্রচার সর্বস্ব এবং অস্পষ্ট বক্তব্য যেমন, 'এ সমাজ ভাঙতে হবে, নতুন

সমাজ গড়তে হবে' অথবা 'ভাত কাপড় বাসস্থান ইসলাম দেবে সমাধান' - এ ধরনের বক্তব্য সমস্যার গভীরে প্রবেশ করছে না। এমনকি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকালীণ সময় বাদে অন্য সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা এলাকার সমস্যা নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছে না। সে তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর সমস্যাকেন্দ্রিক বক্তব্য অধিকতর গ্রাহ্য এবং প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কে এ ধরনের দল বলা হয়।

১৩. নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: বাংলাদেশী জনচরিত্র সম্পর্কে 'নেতিবাচক' দৃষ্টিভঙ্গির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিগত প্রায় এক দশকের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে একই প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। সংগৃহীত দেয়াল লিখন বা শ্লোগানে আদর্শ লক্ষ্য ও কর্মসূচীভিত্তিক বক্তব্যের চেয়ে 'মানি না, মানবো না' ধরনের বক্তব্য প্রাধান্যশীল। ইতিবাচক আন্দোলনেও কতিপয় নেতিবাচক দিক রয়েছে। জ্বালাও-পোড়াও বা গাড়ী ভাঙা এ ধরনের পদক্ষেপের অন্তর্গত। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যে, ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনৈতিক এলিটরা এই ভাঙচুরের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষে যখন অবস্থান করেন জাতির 'সর্বনাশ' দেখেও তারা 'টু' শব্দটি করেন না।

১৪. যুদ্ধংদেহী মনোভাব / মাস্তানবাদ: 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই - লড়াই করে বাঁচতে চাই'। দল বা গোষ্ঠীর নয়। ডান বাম নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল ও তাঁদের ছাত্র ফ''ন্টের এ হচ্ছে এক সাধারণ শ্লোগান। এছাড়া যখন তখন চামড়া তুলে নেয়ার শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। এই চামড়া তোলার শ্লোগান ব্যবহৃত হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতা নেত্রী থেকে স্থানীয় চুনোপুটির বিরুদ্ধে। 'ফাঁসি চাই' এর মতো নেতিবাচক শ্লোগান তো আছেই। এর বাইরেও আছে 'অমুকের কল্লা চাই' 'রক্ত রক্ত রক্ত চাই' অথবা 'একটা দুটো ... ধরো সকাল বিকাল নাস্তা কর' এর মতো চরম যুদ্ধংদেহী শ্লোগান। কোন চরম অবস্থা বা সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে এ শ্লোগান তীব্রতার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। এ ধরনের শ্লোগান সব সময়ই ইঙ্গিতবাহী। আবারও উল্লেখ করতে চাই এটি এককভাবে উচ্চারিত শ্লোগান নয়। যার যেখানে শক্ত অবস্থান তারা সেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাচ্ছন্দে এসব যুদ্ধংদেহী শ্লোগান ব্যবহার করছে। মোট কথা একাডেমিক ভাষায় যাকে বলা হয় Coercive power বা শক্তি প্রয়োগ, বাংলাদেশে তা 'মাস্তানি' রূপে অভিহিত। সঠিক অথবা বেঠিকভাবে হোক 'মাস্তানবাদ' আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫. স্ববিরোধিতা: স্ববিরোধিতা যেমন আমাদের ব্যক্তি জীবনে সত্য তেমনই সত্য সামষ্টিক জীবনে। রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনগুলো যেমন নীতি ও কথা উৎকীর্ণ করে বাস্তবে দেখা যায় তার বিপরীত। কোন কোন দল গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র

বাজার অর্থনীতির কথা সমস্বরে বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক সাথে গুলিয়ে ফেলছেন। আবার কেউ বা সমাজতন্ত্র বা ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে দেদার বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বাস তার অন্যত্র। সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি ঘটছে ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপারে। বাংলাদেশে এমন কোন ছাত্র সংগঠন নাই যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে, বক্তব্য দিচ্ছে না। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে ছাত্র সংগঠনগুলোর কিছু সাধারণ শ্লোগানের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যেমন,

ঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক সাথে - ছাত্রদল।
ঃ সন্ত্রাসীদের কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও - ছাত্র লীগ।
ঃ রক্তস্নাত গণতন্ত্র সংহত করে সন্ত্রাস রুখবোই - ছাত্র ইউনিয়ন।
ঃ অস্ত্র ছাড় কলম ধর, শিক্ষা জীবন রক্ষা কর - ছাত্র ফ"ন্ট।
ঃ সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন - ছাত্র সমিতি।
ঃ চাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের সম্মিলন - ইসলামী ছাত্র শিবির।
ঃ সন্ত্রাসীদের প"ষ্টপোষক সংগঠনসমূহ বর্জন করুন - ছাত্র ফেডারেশন।
ঃ সন্ত্রাসের কবল থেকে শিক্ষাজীবন রক্ষা কর - সমাজবাদী ছাত্র জোট।
ঃ সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়স্থল বন্ধ কর - জাতীয় ছাত্র দল।
ঃ মাস্তানদের দৌরাত্ম দেখে মনে হয় না দেশে কোন সরকার আছে - অলি আহাদ।
ঃ হল থেকে দল থেকে সন্ত্রাসীদোর বহিস্কার করুন - সংগ্রামী ছাত্র ফ"ন্ট।

এইসব শ্লোগান বা দেয়াল লিখন মনগড়া নয়। দেয়াল লিখন ও শ্লোগানে এ রকম শত শত বাক্য আছে। লক্ষণীয় যে, দেশের প্রতিটি ছাত্র সংগঠন ছোট বা বড় ডান কি বাম সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ দেয়াল লিখন লিখছে। নেতা নেত্রীরা কঠিন মন্তব্য করছেন। অথচ সন্ত্রাস কমছে না। বরং রাজনৈতিক দল বা সংগঠনসমূহে এ ধরনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অস্ত্রই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। দৃশ্যতঃ ছাত্ররা যা বলছে, করছে তার উল্টোটি। রাজনীতিকরা যা বলছেন আসলে তা লোক দেখানো লোভনীয় উচ্চারণ মাত্র। তাঁদের কথা ও কাজে কোনই মিল নাই। একজন বোকা লোকও বুঝবে যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহ যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে তখন দেশে সন্ত্রাস করছে কারা? আকাশ থেকে আমদানিকৃত অতি জাগতিক সত্তা? বস্তুতঃ তারাই জোরে শ্লোগান দিচ্ছে, যারা সন্ত্রাস করছে। চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে কোমরে গোঁজা পিস্তল অথবা চাদরের আড়ালে বেরিয়ে পড়ছে রাইফেলের বাট, আর সেই ব্যক্তিই মুখে শ্লোগান দিচ্ছে, অস্ত্রবাজের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক সাথে।' এর চেয়ে স্ববিরোধিতা জঘন্য প্রতারণা আর কি হতে পারে? সবাই বুঝে

সবাই জানে নেতা নেত্রীরা সত্যিই যদি সন্ত্রাস নির্মূলে আন্তরিক হন তাহলে সত্যিই দেশটি সন্ত্রাসমুক্ত হওয়া কঠিন কিছু নয়।

১৬. জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্কট: গোটা জাতি যে জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্কটে নিপতিত আমাদের রাজনীতির ভাষায় তা উচ্চকিত। জাতি পরিচয়, রাষ্ট্রীয় মৌল নীতিমালা, সরকারের ধরন-ধারণ এবং জাতীয় উন্নয়ন কৌশল নিয়ে বহমান বিতর্ক দেয়াল ও শ্লোগানে বিধ"ত। বাঙালী না বাংলাদেশী, ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, ভারত বন্ধু না শত্রু, বাজার অর্থনীতি না নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি নাকি মিশ্র অর্থনীতি ইত্যাকার বিতর্কে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যেমন বিভোর তেমনই দেয়ালও ভরপুর ঐসব বিতর্কে। স্বাধীনতার সপক্ষ বিপক্ষ, ধর্মের পক্ষে-বিপক্ষে, এমনকি আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীকেও রাজনীতিক নেতা-নেত্রীরা বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক দ্বারা জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন দূষিত হয়েছে তেমনই শ্লোগানের ভাষা হয়েছে উষ্ণ। দেয়াল লিখনের ভাষা হয়েছে তিক্ত।

১৭. আকাশ কুসুম বিপ্লবের বাণী: আমাদের দেয়াল গাত্রের উৎকীর্ণ বাণী দেখে যে কেউ আশা করতে পারেন সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব নিশ্চয়ই সন্নিকটবর্তী। নির্বাচনকে সমর্থনের মানদণ্ড ধরলে বামপন্থীরা নিশ্চয়ই হতাশ হবেন। তবে আশার বাণীতে আকাশ কুসুম বিপ্লবী তত্ত্বে দেয়াল পরিপূর্ণ। এদের আশাবাদ দেয়ালের বিপ্লবই হয়তো একদিন সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করবে। লেখাগুলো চমৎকার ভাষায়, কখনো কখনো কবিতার পংক্তিমালার মতো হৃদয়গ্রাহী এই দেয়ালে এতটা শিল্পিতভাবে উপস্থাপিত যে সুন্দর ক্যালিগ্রাফির সাথে তুলনীয়। এরকম কিছু দেয়াল লিখন:

ঃ যে সাগর সব চাইতে সুন্দর তা আজও আমরা দেখিনি, যে শিশুটি সব চাইতে সুন্দর তা আজও ডাঙর হয়ে ওঠেনি, যে সমাজ সব চাইতে সুন্দর তা আজও গড়া হয়নি।

ঃ মোরা ভোরের পাখি দিনের সূর্য কর্নেল তাহেরের আদর্শের রণতুর্য।

ঃ শিল্প আনে চেতনা - চেতনা আনে বিপ্লব - বিপ্লব আনে মুক্তি।

ঃ আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্বে আঘাত হানো আপোসের দুর্গে।

ঃ 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়।'

ঃ বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি এসো তাহলে আজ বিদ্রোহ করি।

ঃ শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য আছে সারা বিশ্ব।

ঃ আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলবে আমি ঘরের নই, পরের; আমি আমার নই, দেশের।

ঃ বিপ্লব ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনামাত্র।

১৮. বিরোধিতা: ভারত বিরোধিতা এবং অন্ধ ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য ভারতের অনিবার্য অবদানের সাথে সাথে লালিত চিরশত্রুতার অবসান ঘটবে বলে আশা করা গেলেও বিজয়ের উষ্ণতা লগ্নেই এ বিরোধের সূচনা। বলতে গেলে নতুন করে পুরোনো ঘটনা। ১৯৯০-২০০০ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহকালে এই প্রবণতার প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ভারত বিরোধিতাকে তাদের রাজনীতির অমোঘ হাতিয়ার মনে করে। এমনকি এদেশে ভারতপন্থী বলে বদনাম কুড়ানো আওয়ামী লীগ ১৯৯১ এর নির্বাচনে পরাজয়ের পর ভারতের প্রতি তাদের 'রণকৌশল' দৃশ্যতঃ পরিবর্তন করে। তারাও ভারত বিরোধিতার ডামাডোলে শামিল হয়।

১৯৯৬ সনের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এর সাথে ভারত বিরোধিতার প্রতিযোগিতায় নামে। বক্তৃতা বিব"তি সংবাদপত্রের ভাষ্য আপাততঃ আমাদের সমীক্ষার অন্তর্গত নয়। শুধুমাত্র শ্লোগান এবং দেয়াল লিখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেই এর যথেষ্ট চলমান প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় স্বার্থের নিরিখে বিশেষতঃ ভারতের অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হল কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি বা বাস্তবতার ধার না ধেরে অন্ধভাবে ভারতকে আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করা। এ ধরনের কিছু শ্লোগান ও দেয়াল লিখনের নমুনা:

ঃ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।
ঃ সিকিম নয় ভুটান নয় - এদেশ আমার বাংলাদেশ।
ঃ বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্ব"ত্ত।
ঃ ভারত যাঁদের মামাবাড়ি বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।
ঃ রুশ ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান।
ঃ রুশ ভারত মার্কিন-ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।
ঃ নাস্তিক রাশিয়া কিংবা বিধর্মী ভারত নয়, এদেশ আমার বাংলাদেশ।
ঃ সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নাই।
ঃ মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও।
ঃ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা চাই।
ঃ হটাও ভারত বাঁচাও দেশ.... নির্দেশ।
ঃ ভারতের দালালেরা হুশিয়ার সাবধান।
ঃ চল চল অযোধ্যা চল - বাবরী মসজিদ উদ্ধার কর।

১৯. ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্য: বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্র সমাজ একটি প্রবল শক্তি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন তথা খালেদা জিয়া হটাও আন্দোলনে রাজনীতিকদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তবে

ছাত্র সমাজ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে ছাত্রদের মতো 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র এরকম সহজ সৈনিক আর পাওয়া যায় না। জাতীয় নির্বাচনসমূহে বিশেষতঃ '৯১ এবং '৯৬ এ রাজনীতিবিদদের বিশ্বস্ত কর্মীবাহিনী হিসাবে ছাত্র সংগঠনসমূহের কার্যকর ভূমিকা ছিল।

আর সে হিসাবে আমাদের চলমান সমীক্ষায় অর্থাৎ দেয়াল লিখন ও শ্লোগানে অতি সঙ্গতভাবেই ছাত্র সংগঠনসমূহের প্রাধান্য ছিল। আনুমানিক ৭০% লেখাই ছাত্র সংগঠনের নামে লেখা হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, বাকী ৩০% লেখাও অধিকাংশ কোন ছাত্রকর্মীদের লেখা যদিও তা রাজনৈতিক দলের নামে লেখা। ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্যের সাথে সাথে ছাত্রনেতাদের আকাশচুম্বী জয়গাথা দেয়ালের শোভা বর্ধন করেছে। এ সম্পর্কে ব্যক্তি প্রাধান্য অংশে আরও তথ্য দেয়া হয়েছে।

ছাত্র সংগঠনের প্রবল প্রাধান্য অনুভূত হওয়ার সাথে সাথে এটাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, যাঁরা এসব শ্লোগান লিখছে তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য এক রকম নাই বল্লেই চলে। ছাত্র সমাজের নিজস্ব পরিমণ্ডলের সমস্যা যেমন: শিক্ষা বা লাইব্রেরী উপকরণ, আবাসিক সমস্যা, খাদ্যমান, পড়াশুনাও পরীক্ষা নিয়ে ক্যাম্পাসসমূহে খুব কম দেয়াল লিখন লক্ষ করা গেছে। সভা সমাবেশে এসব দাবীর প্রতিধ্বনি ক্ষীণতর পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রাবল্যে ছাত্রদের নিজেদের সমস্যা এক রকম ধাপাচাপা পড়ে আছে।

২০. বাম রাজনীতির গতিশীলতা ও ডানপন্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাম, ডান ও মধ্যপন্থী। ক্ষমতার বলয়ে মধ্যপন্থীদের অবস্থান এবং পালাবদল। বামপন্থীরা ক্ষমতার বলয়ের বাইরে থাকলেও 'পেশাজীবী শ্রেণী' ও 'বুদ্ধিজীবী' মহলে তাদের অবস্থান এবং তৎপরতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট। এই বুদ্ধিজীবী মহল সমাজের প্রগতিশীল অংশ বলে পরিচিত। তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিব"ত্তিক চর্চা, সমর্থন এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে বাম ধারার রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট। আমাদের সংগৃহীত দেয়াল লিখন ও শ্লোগানেও তাঁদের ঐ মেধা ও মনন বিধ"ত। উদ্ধৃতির কলেবর ব"দ্ধি না করে যে কেউ ডান, বাম এবং মধ্য ধারার শ্লোগান ও দেয়াল লিখনগুলোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি আলোকিত হয়ে ওঠবে। বাম ধারার বক্তব্যে একটি ব্যঞ্জনা, প্রত্যয় এবং গতিশীলতা আছে। অপরদিকে, ডান ধারার বক্তব্যকে স্থবির, পুরনো এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক মনে হয়েছে। ডান ধারার দলগুলো ক্ষয়িষ্ণু। তাই বক্তব্যে ও প্রচারেও একই অবস্থা। একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠনটি 'মৌলবাদী' প্রত্যয়ে তিরস্কৃত। এ সংগঠন তাঁদের বক্তব্যে শাণিত। তাঁদের বক্তব্যে

আছে নতুনত্ব। আছে 'হেরার রাজতোরণে' ফিরে যাবার আহ্বান। কিন্তু তারা বাম ধারাকে চ্যালেঞ্জ করা, বিকল্প শক্তির প্রতিষ্ঠা অথবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তাঁদের পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে না। তবে সর্বত্র তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সামগ্রিকভাবে ডানপন্থীদের মধ্যে বুদ্ধিব"ত্তিক বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে। বামপন্থীরা সরব, সক্রিয় এবং শক্তিশালী। এইক্ষণে শ্লোগান ও দেয়াল লিখনগুলো তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কোন উজ্জ্বল উদারনৈতিক ধারার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি।

২১. ক্রমশঃ বিকশিত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিঃ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র বিকাশমান। জাতি হিসাবে পুরনো হলেও গণতন্ত্রের পথে আমাদের অভিযাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীন জাতি হিসাবে অভ্যুদয়ের পরেও গণতন্ত্রের 'ম্যারাথন রেসে' আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক হার্ডলস। ১৯৯০ সনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আমাদের গণতন্ত্রের পথে নতুন করে পুরনো যাত্রা শুরু করতে হয়। ১৯৯০-৯৮ এই সময়কাল গণতন্ত্রের অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সময়কাল। প্রায় এক দশকের স্বৈরশাসনের পর গণতান্ত্রিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক। তাই একটি নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরে যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল আচরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একটি অভাবনীয় ঐকমত্যের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের লক্ষ্যে দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। কিন্তু এই সুখবর অবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করেনি। রাজনৈতিক এলিটরা একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে অস্থিরতা ও অশান্তির গৃষ্টি হয়। বিষয়টি অবশেষে ডান-বাম অথবা ইসলাম পছন্দ বনাম প্রগতিশীলদের লড়াইয়ে পরিণত হয়। অবশ্য শীঘ্রই সমীকরণের অদল বদল ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে জাতীয় সংসদের বিরোধী শিবিরে বৈপরীত্যের মাঝেও সমঝোতার গৃষ্টি হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন যতটা এগুতে থাকে বিরোধী পক্ষের সমঝোতা তত সুদৃঢ় হতে থাকে। অবশেষে, সরকার বনাম বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাবাদর্শের সংঘাত ক্রমশঃ ম্রিয়মান হতে থাকে। গণতন্ত্রীরা স্বৈরতন্ত্রের খেতাব নিয়ে পদত্যাগ করে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনকালীন আচরণবিধি ঘোষণা করে। এছাড়া কিছু আইনগত বিধি-বিধানের কথাও ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক এলিটরাও কম বেশী দায়িত্বশীল আচরণ করে। দেশে পুনরায় একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির শুভ সূচনা হয়। নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তী ছোট-খাট ঘটনা বাদে পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য থাকে। ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে আবার আর একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রায় চার বছর ধরে সরকার পরিচালনা করছে। বিগত প্রায় এক দশকের Trial and Errors এর

মধ্য দিয়ে জাতি গণতন্ত্রকে আরও প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠানটি একটি উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি। বিশেষতঃ নির্বাচনকে স্বচ্ছ নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি চমৎকার সংযোজন। এছাড়া মেয়াদ শেষে সরকারকে বিরোধীদের সমপর্যায় এসে নির্বাচনের যে বিধান প্রবর্তিত হল তা শাসক দলের জবাবদিহিতার জন্য এক অনন্য প্রয়াস।

২২. মধ্যবর্তী সময় ও মধ্যবিত্তের সঙ্কট: আমাদের সমীক্ষা প্রমাণ করে যে, পুরনো সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের সামান্যটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে। আধুনিকায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারনীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন কোন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়নি। সৃজনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী নব্য ধনিক শ্রেণীর বিকাশের ফলে অবক্ষয়মান। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পশ্চিমা ভোগবাদী প্রবণতা স্পষ্ট। কালো টাকা, অস্ত্রের ঝনঝনানি, মাস্তানবাদ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারের ফলে দেশজ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তেমন বিকশিত হতে পারছে না। সততা, সদ্ব্যবহার, কর্তব্যনিষ্ঠা, জনগণের প্রতি মমত্ব ইত্যাদি বাংলার আবহমান লালিত গুণাবলী বস্তুবাদের প্রবাহে ভাটা পড়েছে। বস্তুত, আধুনিক ভোগবাদ ও লালিত আদর্শবাদের মধ্যবর্তী সময় চলছে এখন।

এই মধ্যবর্তী সময় সবচেয়ে সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে চির প্রতিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাংলাদেশের প্রতিটি রাজপথে আর দেয়ালে যে বক্তব্য বিব"ত মার্কস এর শ্রেণী বিশ্লেষণের ব্যাকরণ অনুযায়ী বলতে গেলে এর অধিকাংশই মধ্যবিত্ত চিন্তাপ্রসূত। 'শিক্ষিত নগর নির্ভর বাঙালীর চিন্তা ও চেতনা আজ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু, অসহনশীল ও পরস্পর বিরোধী এবং এসবেরই অনর্গল ও যথেচ্ছ বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে, ঘটছে দেয়ালে দেয়ালে, নগরীর যত্রতত্র প্রাচীর গাত্রে।'

সমাজ বিকাশের বিবর্তনে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সব সময়ই একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। আর এই বিবর্তনের মাঝেই মধ্যবিত্তের বিকাশ লালন ও প্রতিষ্ঠা। এতদাঞ্চলে ব"টিশ রাজত্বের শেষ দিকে (১৯২০-৩০) হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা আরও পরে। দেশ বিভক্তির পর ৫০-৬০ এর দশকে এই মধ্যবিত্ত দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম দ্বারা অনুরণিত। দেশের মানুষের এমনকি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, দরিদ্র মানুষের প্রতি এদের গভীর দরদ রয়েছে। প্রয়োজনে এইসব 'নমূঢ় মুখে' হাসি ফোটানোর জন্য মধ্যবিত্ত কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ ও কষ্টভোগ করতে সম্মত। গ্রামে বাস করলেও গ্রামীণ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য মধ্যবিত্তের একটি মানবিক অনুভূতি রয়েছে। তার কারণ এক সময় এরা গ্রামে ছিল। গ্রামের সাথে রয়েছে এদের নাড়ীর টান। শহরের কলকারখানার শ্রমিক, রি*াওয়ালা, দিনমজুর, ছোট দোকানদার, অর্থাৎ তাবৎ শ্রমজীবী মানুষের দাবী এবং আশা আকা□ক্ষা মধ্যবিত্তের সৌজন্যে উঠে আসে দেয়াল গাত্রে।

এরাই জনসংখ্যার ৮০ ভাগ। এরা নিরক্ষর অথবা স্বল্পসাক্ষর। এরা ব"ত্তিহীন এবং ভূমিহীন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে এঁদের বিত্ত এবং বিত্তের ব্যবধানও কম নয়। মধ্যবিত্তরা মুষ্টিমেয় হলেও এঁরা নগরবাসী অথবা নগরমুখী। এঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুখী। বিদেশ যাত্রার রোগে এঁরা দারুণভাবে রুগ্ন ক্লিষ্ট। এই মধ্যবিত্তের ধ্যান-ধারণা, ভাব কল্পনা, যুক্তিবুদ্ধি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান অনেকটাই ঐতিহ্যবাহী সংস্কার, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও প্রচলিত মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ গরীব জনগোষ্ঠীর সাথে এদের আশা এবং গন্তব্যেও রয়েছে ব্যবধান। তারপরও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঐসব মানুষের মুখপাত্র। তাঁরাই পরিবর্তনের হাতিয়ার। সামাজিক নেতৃত্বে এখনও প্রবলভাবে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। যদিও ধনিক বণিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রবলভাবে বিকাশমান একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রম ক্ষয়িষ্ণু। আর একটি ক্রমশঃ উর্ধ্ব ধাবমান। সুতরাং মধ্যবিত্ত আর বিত্তহীনদের ব্যবধান কমে আসছে। প্রতিদিন এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পথে ঘাটে। হাটে-বাজারে, রেলগাড়ীতে এবং দেয়াল লিখনে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, রুচি আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। না হয় বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এই নিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিকের নেতৃত্বে বিব্রত ও বিপন্নবোধ করছেন। অথচ নতুন কোন মূল্যবোধ, রুচি ও আদর্শ প্রভৃতি গড়ে উঠছে না। যাকে আশ্রয় করে নতুন একটি শ্রেণীর নেতৃত্ব দানা বাঁধতে পারে। এই বিত্তহীন এবং মধ্যবিত্তদের দাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র তার যথার্থ ভূমিকা পালন করে না। কারণ, ওসবের অধিকাংশ জুড়েই ক্ষমতাসীন সরকার, কায়েমী স্বার্থবাদ অথবা বিশেষ মতাদর্শকেন্দ্রিকতা ঘিরে থাকে। তাই ব"হত্তর জনগোষ্ঠীকে 'ম্যাসেজ' পৌঁছে দেবার অবলম্বন উচ্চকিত কণ্ঠ এবং মাধ্যম হচ্ছে দেশের বিস্তীর্ণ দেয়াল।

## উপসংহার

লব্ধ গবেষণা উপকরণ এবং ইতোপূর্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি খণ্ডিত। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর শ্লোগান বিশ্লেষণ করেছি। সংগৃহীত দেয়াল লিখনও পর্যালোচনা করেছি। তাতে যে সমস্ত গতি প্রকৃতি (trend and tendency) রয়েছে দফাওয়ারি সে বিষয়গুলোও সঙ্কটে নিপতিত। আর জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্কট এই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা নাগরিক সাধারণের জন্য একটি অভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারিনি। রাজনৈতিক দল বিশেষতঃ স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক এলিট ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁরা নিজ নিজ দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচী দ্বারাই দেশ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম ও সরকারি কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি কা[]ক্ষত মূল্যবোধের সংহতি (Values Integration) সব সময়ই উপেক্ষিত

হয়েছে। ফলে রাজনীতিতে সর্বজনস্বীকৃত বৈধতার সূত্র (Legitimacy Formula) গড়ে উঠতে পারেনি। রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা (Political Instability) এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা (Political Unrest) এর মৌল কারণ ওখানেই নিহিত। উন্নত দেশগুলোতে সর্বত্র রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কৌশলগত ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ থাকতে পারে। জাতীয় নীতি ও লক্ষ্যকে কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না। আলোচনা সমালোচনা যাই হোক না কেন অবশেষে তাঁরা বিরোধের মাঝে ঐক্যের সূত্র (Unity in Diversity) আবিস্কারে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সমাজ শতধা-বিভক্ত।

একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের চার মৌলনীতির ব্যাপারে প্রধান চারটি দল একমত নয়। এমনকি ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দেখা গেছে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনায় প্রধান চারটি দল চার রকম মত পোষণ করছে। এইসব নানা কারণে বাংলাদেশে একটি আত্নসচেতন জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও কা[illegible]ক্ষত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা Civic Culture গড়ে ওঠেনি। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞ মহল অভিহিত করেছেন খণ্ডিত রূপে। তবুও দেশ ও জনতা আশাবাদী গণতন্ত্রের বন্ধুর পথযাত্রার মধ্যদিয়ে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। কোটি কোটি মুক্তি উদ্বেল মানুষ 'যত মত তত পথের' মাঝেও খুঁজে পারে অভীষ্ট গন্তব্য।

**তথ্যসূত্র**

সরদার ফজলুল করিম (১৯৮৬) *দর্শনকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

আবদুস সামাদ গায়েন (১৯৯১) ভোটযুদ্ধে দেয়াল লিখন: বাংলাদেশ। *চতুরঙ্গ*, বর্ষ-৫২, সংখ্যা-১, মে, কলিকাতা।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সম্পা: (১৯৯০) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, ঢাকা: ইউপিএল।

হাসান উজ্জামান (১৯৭৮) *সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি*, ঢাকা: বুক হাউস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (১৯৯২) ধর্মের নামে রাজনীতি, *বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা।

Almond, G. A., & S. Verba (1963) *The Civic Culture.* Princeton: Princeton University Press.

Almond, G. A., & G. Powell (1972) *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi: Amerind.